ভ্রমণ কাহিনী - পুরী : ক্লাস ৭-৮

(সিডি ১৩/এনডিডবি)

এইবার পুজোর ছুটিতে দাদু, ঠাম্মা, বড়মা সবাইকে নিয়ে শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরী যাবার কথা হল। যাবার কথা শুনে বাবার বন্ধু পার্থকাকুরাও আমাদের সঙ্গে যাবে বললেন। অনেক আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট কেনা হল। কেননা পুরী এমনই একটা জায়গা যেখানে অধিকাংশ বাঙালিরাই বছরে একবার-দুবার বেড়াতে যায়। কাকুরাও প্রত্যেক বছর একবার করে পুরী ঘুরতে যান। হাওয়া বদলের জন্যও জায়গাটি খুব উপকারি।

অক্টোবরের ১৭ তারিখ যাবার টিকিট হল। ১৬ তারিখ দুর্গাপুজোর দশমী। ঠাকুর ভাসান হয়ে গেলেই পরদিন রওনা দেব। একে তো পূজোর আনন্দ, নতুন জামাকাপড়, খাওয়াদাওয়া, ঘোরা-বেড়ানো তারপরই আবার পুরী! আমাদের আনন্দের আর শেষ নেই। কি কি জিনিস নেব সব ঠিক হল। পুজোর নতুন জামাগুলো তো অবশ্যই নেব।

অবশেষে খুব মজা করে দুর্গাপুজো কাটিয়ে আমরা পরদিন সকাল ছটায় হাওড়া থেকে ধৌলি এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম বারোজনে। আমরা তিন ভাইবোন, বাবা, মা, দাদু, ঠাম্মা, বড়মা আর পার্থকাকুরা চারজন। ট্রেনে উঠে মালপত্তর জায়গায় রেখে একটু খাওয়াদাওয়া করলাম। তারপর দেখলাম অনেকের চোখেই ঘুম এসে গেল। আমরা ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে আর বকবক করতে করতে দুপুর দুটোর সময় পুরী পৌঁছে গেলাম। আমাদের আগে থেকে হোটেল ঠিক করাছিল। দুটো গাড়ি করে আমরা হোটেলে গিয়েই হাতমুখ ধুয়ে, ডাইনিং হলে খেতে গেলাম।

পুরীতে সমুদ্র ছাড়াও আরো একটা আকর্ষণ জগন্নাথ দেবের মন্দির। দুপুরে এখানে ভীষণ গরম তাই আমরা দুপুরটুকু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে তিনটে অটো ভাড়া করে সবাই মিলে জগন্নাথ দর্শনে গেলাম। বহু পুরনো এই মন্দিরের বেশ উচ্চতা। কিছু কিছু অংশ ভেঙে যাওয়ায় এখন সেগুলো সারান হচ্ছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে মন্দির এলাকা। বাইরে জুতো রেখে ভিতরে প্রবেশ করলাম। পঁচিশটা সিঁড়ি উঠে মন্দির চত্তরে যেতে হয়। বাবা বড়মাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রচন্ড ভীড় ঠেলে সবাই মিলে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। যেখানে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা থাকেন সেই জায়গাটাকে বলে ‘গর্ভগৃহ’। লাইন করে ভেতরে ঢুকেই ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল। সবাই তার মধ্যেই ঠাকুরের বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে ‘জয় জগন্নাথ’ বলে চিৎকার করছে। ঠাকুর প্রদক্ষিণ করে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে দেখি খুব ভীড় করে লোকে মেঝেতে বসে রয়েছে। তখনি একটা পান্ডাদের ছেলে মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বাঁধতে উঠবে। আমরা ওখানে বসে ধ্বজাবাঁধা দেখলাম। ছেলেটা মন্দিরের দিকে পিছন করে গড়গড় করে উঠে ধ্বজা বেঁধে আবার নেমে এলো। আমরা সবাই প্রণাম করে ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের ধারে বসে রইলাম। মায়েরা কেনাকাটা করতে গেলেন ‘স্বর্গদ্বার’। পুরীর যেখানটায় সমস্ত দোকানপাট, সারিসারি হোটেল আর লোকেদের বসার জন্যে সমুদ্রের পারে বাঁধান জায়গা, সেই জায়গাটাকেই স্বর্গদ্বার বলে। ওখানে শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের মূর্তি আছে। কথিত আছে মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শন করে এইখানেই সমুদ্রে বিলীন হয়েছিলেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই সমুদ্রে স্নান করতে নামলাম। বাবা তিনটে নুলিয়া, যারা সমুদ্রে মানুষদের ধরে স্নান করায়, নিয়োগ করলেন। প্রায় তিনঘন্টা সমুদ্রের জলে কাটিয়ে হোটেলে এসে আবার কলের জলে স্নান করে নিলাম। দাদু, মা, ঠাম্মারা হোটেলেই ছিলেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলে সমুদ্রের ধারে গেলাম। রাত নটা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে এলাম। এইভাবে তিনদিন যে কি করে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। গানে, গল্পে, আড্ডায় বাকি সময়টুকুও কেটে গেল। ফেরার দিন সকাল থেকেই মনখারাপ। সবাই মিলে স্বর্গদ্বারে গেলাম। ওখানে কচুরি আর তরকারি খেয়ে সব দোকান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মায়েরা প্রচুর কেনাকাটা করেছে। আমরা স্কুলের বন্ধুদের জন্য টুকটাক কিছু জিনিস কিনলাম। দুপুরের মধ্যে হোটেলে ফিরে খাওয়া সেরে গোছগাছ করে নিলাম। রাত্রি দশটায় আমাদের ট্রেন জগন্নাথ এক্সপ্রেস।

বাড়ি ফিরে সবার মুখে কেবল পুরী ঘোরার কথাই হতে লাগল। এই ভ্রমণের স্মৃতি মনে রয়ে গেল। স্কুল খুলতে এখনো দুদিন বাকি তাই আমাদের ভ্রমণ কাহিনীটা লিখে ফেললাম। পরীক্ষায় কাজে দেবে।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪